যুগান্তর

তারিখ ... 14 SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম ১...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

> উদ্বেগের বিষয় হল, এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

আশ্চর্যই বলতে হয়, দেশের পুরনো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবই চলছে অস্থায়ী সনদের ভিত্তিতে। যে আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছে, সে আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে সেগুলোর স্থায়ী সনদ গ্রহণের কথা। কিন্তু তা করা হয়নি। অর্থাৎ বলা চলে, এসব বিশ্ববিদ্যালয় এখনও চলছে অবৈধভাবে। শুধু স্থায়ী সনদের ক্ষেত্রেই আইন লংঘিত হচ্ছে না, বস্তুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসনও চলছে বেআইনিভাবে। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে চলার কথা থাকলেও কৌশলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) বা মালিক পক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো সেগুলো চালাচ্ছে। বস্তুত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মালিক পক্ষের খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নামে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবাধে দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তি ও সনদবাণিজ্য চালিয়ে গেলেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এসব দেখার কেউ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে মাঝে-মধ্যে দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে পত্র দেয়া হলেও বস্তুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। ফলে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে নানা রকম অনিয়ম আর অনাচার। মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে নামকাওয়াস্তে পাঠদান, কোচিং সেন্টারের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়ায় শিক্ষক এনে জোড়াতালির ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রিসহ এমন সব কীর্তিকলাপ চলছে— যা এক কথায় ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে এরকম নৈরাজ্য চলার খবরে শংকিত না হয়ে উপায় নেই।

শিক্ষাগুরু সক্রেটিস থেকে শুরু করে নিকট-অতীতের টোল পণ্ডিতরা জ্ঞান বিতরণের কাজকে ঐশ্বরিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু যুগ-পরিবর্তনের হাওয়ায় দৃশ্যপট আমূল পাল্টে গেছে। জ্ঞান বিতরণের কাজটি এখন পরিণত হয়েছে বাণিজ্যের উপকরণে। প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির পর শিক্ষা-বাণিজ্যে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা একেকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্যাকেজ আওতায় জাতিকে জ্ঞান বিতরণের মহৎ কাজটি করে চলেছেন। জ্ঞানার্জনের উপায়, পদ্ধতি ও পরিবেশ যাই হোক না কেন, অভিভাবকের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকলে এখানকার ছাত্রত্ব অর্জন করা যায় না। দেশে পাসের হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তবে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এরই সুযোগ নিয়ে অনেকেই কোচিং সেন্টারের আদলে বহুতল ভবনের একটি বা দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাণিজ্যের পসরা খুলে বসেছেন। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০টির বেশি হলেও স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে পাঠদানের সদিচ্ছা দেখিয়েছে মাত্র কয়েকটি।

মনে রাখা দরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মানে হাজার-বারশ' বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট কয়েকটি ক্লাসরুম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা অনেক ব্যাপক। নিজস্ব ক্যাম্পাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, পাঠাগার ও গবেষণাগারসহ সমন্বিত পাঠদানের জন্য আনুষঙ্গিক সবকিছুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। অথচ বাস্তবে আমরা কী দেখছি? বিপণি বিতান, বাসস্ট্যান্ড, আবাসিক এলাকা, এমনকি শিল্প-কারখানার আশপাশের ভবনে গড়ে ওঠা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় না আছে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষক, না আছে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিদার প্রতিষ্ঠানগুলো চটকদার বিজ্ঞাপন আর নানা কৌশলের আড়ালে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায় করে যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাতে প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত। উদ্বেগের বিষয় হল, এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক নয়। দেশের আর দশটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলে, একই চিত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিরাজ করে, তবে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিকেই উৎসাহ দেয়া হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিরাজমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃংখলা দূর করার ব্যাপারে সরকার অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেবে— এটাই প্রত্যাশা।